আমি সেই অহংকারে অহংকারী

সিরাজুস সালেকিন

হাজার বছর ধরে আমাদের বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা আর টিকে থাকার জন্য লড়াই করেছে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা আর জলোচ্ছাসের বিরুদ্ধে। বন্যা আর নদীভাঙনে সব হারিয়ে আবার ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে বসতি। এই জনপদের মানুষ জলের ঐশ্বর্য্য লুটে জীবনের উপাদান এনেছে। একে অপরের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। নরম পলিতে বুনেছে শষ্যের বীজ। বিরাণ লোকালয়ে গড়ে তুলেছে জনপদ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসাথে থেকেছে, ভাগ করে নিয়েছে প্রতিদিনকার হাসি-কান্না, দু:খ-কষ্ট। নবান্নে কষ্টের ফসল ঘরে তুলে কৃষকরা আনন্দে মেতেছে একসাথে। যাত্রা, জারী, সারি, কবিগান, পুথিপাঠ, মেলা - এই নিয়েই ছিল বাঙালির দিনকাল। ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও বাঙালি কখনো মৌলবাদী ছিল না। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান একসাথে মিলেমিশে বাস করতো। এই ছিল আমাদের বাঙালির চালচিত্র।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর আমতলায় জনসভা

কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় বাঙালিকে বার বার যুদ্ধও করতে হয়েছে নানা অপশক্তির বিরুদ্ধে। ডি এল রায়-এর সেই বিখ্যাত গানের একটি কথা খুব ভাবায় আমাকে - 'ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'। সত্যিই অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বাঙালির জীবন।

বায়ান্নর একুশের সড়ক বয়েই তো আমাদের জাতিসত্তা আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসত্তা, বাঙালিত্বের উদ্বোধন, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ আর পাকিস্তানী স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার সোপানের ভিত্তি, স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা। একুশ রক্ষা করেছে আমাদের মায়ের মুখের ভাষা বাংলাভাষাকে আর একাত্তর রক্ষা করেছে সমস্ত বাঙালি জাতিকে। এক কথায় বাংলাদেশ আর বাঙালির আত্মপরিচয়ের উৎসবিন্দু বায়ান্নর - একুশ।

একুশ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। যে একুশ ছিল একমাত্র বাঙালির, তা আজ গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌছে গেছে এক বিশেষ ব্যাঞ্জনায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। আজ বিশ্বের সব ভাষাভাষী মানুষ জেনে গেছে আমাদের সেই অকুতোভয় বীর বাঙালিদেরকে যারা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে মায়ের ভাষাকে। বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালি নতুন পরিচয়ে অভিসিক্ত হয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি সেই সব ভাষা-যোদ্ধাদের, স্বশ্রদ্ধচিত্তে উচ্চারণ করি: 'মরণসাগর পারে তোমরা অমর - তোমাদের স্মরি'।

একদিকে দেড় হাজার মাইল দূর থেকে আইয়ুবী দু:শাসন - আর এ দিকে আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব, নাটক আর অবিস্মরণীয় সব আগুনঝরা গনসঙ্গীত দিয়ে এর মোকাবিলা।

বাঙালির সমস্ত আন্দোলনেই আমরা দেখতে পাই রাজনীতিবিদ, পেশাজীবিসহ সব শ্রেণীর মানুষের সাথে সাথে শিল্পীরাও এগিয়ে এসেছে স্বত:স্ফুর্তভাবে, সামিল হয়েছে সমস্ত প্রতিবাদী যুদ্ধে। বাঙালি কবি, সাহিত্যিক, গায়ক-গায়িকা, চিত্রকর, যন্ত্রশিল্পী, লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার - এদের ও একটা ব্যাপক ভূমিকা ছিল বাঙালির সব যুদ্ধে আর আন্দোলনে। সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে এই সমন্বিত শিল্পী সমাজ অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। এগিয়ে এসেছে জাতির যে কোন দূর্যোগময় মুহূর্তে। সাধারন মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে বাঙালির দাবীর সমর্থনে।

১৯৫২র ২২শে ফেব্রুয়ারীর গনমিছিল, সামনে আতাউর রহমান খান

১৯৪৩ এ দূর্ভিক্ষ-র ওপরে জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবি আজো আমাদেরকে হতবাক করে, বিজন ভট্টচার্য রচিত 'নবান্ন' গীতি-নাট্য একটি অসাধারন মাইল ফলক। ১৯৪৬ এ তে-ভাগা আন্দোলনের ওপর রচিত গান 'হে সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো - আজো আমাদের যে কোন আন্দোলনের সময় প্রেরণা দেয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান, গান্ধীজির সত্যাগ্রহের সমর্থনে ডি এল রায় এর গান, আমাদের ৬৯-এর গন-আন্দোলন ও ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ ও ভারতের গীতিকার, সুরকার আর কণ্ঠশিল্পীদের রচিত ও পরিবেশিত অসংখ্য গান ও কবিতা আজো অমর হয়ে আছে, যতদিন পৃথিবীতে বাঙালি বেঁচে থাকবে - এসব গান-কবিতা তাদের পথ দেখাবে। এসব গান-কবিতা আমাদের বাঙালিদের দৈনন্দিন দিনযাপনের অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে।

১৯৫২ তে আমাদের ভাষা আন্দোলনের সময় রচিত বেশ কিছু গান ও কবিতা এখনো আমাদের আন্দোলিত করে। সেসময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত একটি গানের জন্মকথা সম্পর্কে আমি সামান্য আলোকপাত করতে চাই। এ গানটির প্রথম সুরকার ছিলেন আমার বাবা - প্রয়াত শিল্পী আবদুল লতিফ। এই গানটি সমস্ত বাঙালি এই গানটি চিরদিন গাইবে, স্মরণ করবে আমাদের সব বীর সন্তানদের যারা ভাষার তরে শহীদ হয়েছে, আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে একটি প্যামপ্লেট ছাপানো হয় ও এটি জনসাধারনের মধ্যে বিলি করা হয়। এই প্যামপ্লেটটিতে দীর্ঘ একটি কবিতা ছিল: আমার ভাইএর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি', কিন্তু এর রচয়িতার নাম ছিল না। ১৯৫২ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আতিকুল ইসলাম (অধ্যাপক ড: রফিকুল ইসলাম-এর ছোট ভাই) ওই কবিতাটি তুলে দেন শিল্পী আবদুল লতিফ এর কাছে। অনুরোধ করেন কবিতাটিতে সুর করে গাওয়ার জন্য। পরে জানা যায় যে কবিতাটি রচনা করেন সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী।

বা থেকে: শেখ লুৎফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, ফাহমিদা খাতুন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ (ফ্রক পরা) ও অন্যান্যরা

আবদুল গাফফার চৌধুরী

১৯৫২ সালে আবদুল গাফফার চৌধুরী ছিলেন ঢাকা কলেজের বিদায়ী ছাত্র। মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের ওপর গুলি চলেছে শুনে তিনি মেডিকেল কলেজে যান খবর নিতে। আউটডোরে একটি ছাত্রের লাশ পড়ে থাকতে দেখে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। গুলিতে নিহত ছাত্রটির মাথার খুলি উড়ে গেছে। লাশটি ছিল শহীদ রফিকুদ্দীনের। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারী নিহতদের স্মরণে গায়েবী জানাজা হবে - মওলানা ভাসানী গায়েবী জানাজায় ইমামতি করবেন। জানাজা শেষ হবার পর গনমিছিল শুরু হয়। এ মিছিলে আবদুল গাফফার চৌধুরী শরীক হন এবং এক পর্যায়ে পুলিশের বেটনের আঘাতে তিনি আহত হন এবং অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে কার্জন হলে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে গেন্ডারিয়ায় এক বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ বাসাতেই আহত অবস্থায় তিনি অবিস্মরণীয় কবিতাটি রচনা করেন: আমার ভাইএর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'। গেন্ডারিয়ার একটি গোপন সভায় একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এ ইশতেহারে কবিতাটি প্রথম ছাপানো হয়।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর ভাষায় ''একদিন লতিফ ভাই (শিল্পী আবদুল লতিফ) আমাকে বললেন 'গাফফার, আমি তোমার 'আমার ভাইএর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি' কবিতায় গান আকারে সুর দিয়েছি'। আমি তাকে বললাম 'এটি একটি বিরাট কবিতা, এর কি পুরোটা সুর দিয়েছেন? তিনি বললেন 'হ্যা, পুরোটাই সুর দিয়েছি। লতিফ ভাইএর কথা শুনে নিজেকে খুব ধন্য মনে করলাম। খুশী হোলাম এই মনে করে যে লতিফ ভাইএর মত একজন বিখ্যাত সুরকার গানটিতে সুর দিয়েছেন। তিনি নিজেও ভাষা আন্দোলনের ওপর আর একটি অমর গান রচনা করে সুর দিয়েছেন - 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়'। এ গানটিও তখন অসাধারন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই গান বাংলাদেশে সমস্ত গ্রামবাংলাকে প্লাবিত করেছিল এক নতুন চেতনায়''।

আবদুল লতিফ কবিতাটির সুরারোপ করেন এবং প্রথম ১৯৫৩ সালে গুলিস্তানের ব্রিটানিয়া হলে ঢাকা কলেজের নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানে গানটি পরিবেশন করেন। গানটির সুর ও বাণী উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর ও ছাত্রদের মনে আলোড়ন তোলে। তাদের অনুরোধে বার বার শিল্পীকে গানটি গাইতে হয়।

শিল্পী আবদুল লতিফ, ১৯৫২ সাল

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হয় এই যে - আতিকুল ইসলাম, ইকবাল আনসারী খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ইনাম আহমেদ চৌধুরী, প্রমুখ সহ ১১ জনকে ঢাকা কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়। পরে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুরোধে শহীদ সেহরেওয়ার্দী বহিস্কারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানালে বহিস্কার আদেশ তুলে নেয়া হয়। সে বছরই গানটি গাওয়ার অপরাধে শিল্পী আবদুল লতিফ এর বাসায় পুলিশ আসে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে। তবে গ্রেফতার করতে আসা পুলিশ অফিসার দুজনেই ছিলেন বাবার পরিচিত। কাজেই বাবাকে দিয়ে তারা একটি সাদা কাগজে লিখিয়ে নেয় যে বাবা না বুঝে এ গানটি করেছে - ভবিষ্যতে আর গানটি গাইবে না। তবে বাবা এ

আদেশটি মেনে চলেননি। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এবং শিল্পী আবদুল লতিফ এর সুরে এই গানটি এত জনপ্রিয়তা পায় যে ঢাকা শহরের যে কোন অনুষ্ঠানেই, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজিত প্রায় সব অনুষ্ঠানেই শিল্পী আবদুল লতিফ এর ডাক পড়তো এবং এই গানটি গাইতেই হোতো। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বাবা যদি গানটি সুর না করতেন - তবে এ গানটি কোনদিন হয়তো আলোর মুখ দেখতো না।

১৯৫৬ সালে শিল্পী আলতাফ মাহমুদ বাবার অনুমতি নিয়ে একটি বিদেশী চার্চ সঙ্গীতের সুরের অনুকরণে গানটি পুনরায় সুর করেন যেটি আমরা এখন শুনতে পাই। এ সুরটিই বাংলাদেশে এখন গীত হয়ে আসছে এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেন শিল্পী আলতাফ মাহমুদ।

শিল্পী আলতাফ মাহমুদ

সব শেষে বাবার লেখা একটি গান দিয়ে শেষ করছি:

আমি সেই অহংকারে অহংকারী
গর্ব করি তাই
আমি যে রফিক শফিক সালাম জব্বার
বরকতেরই ভাই।।

বাংলা ভাষা অমর হোক, বাঙালির জয় হোক।।